ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪২২

বুদ্ধদেব বসুর কাব্যে প্রকৃতি ও প্রেম

মোঃ রবিউল ইসলাম*

সারসংক্ষেপঃ রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে প্রতিভাধর কবি হিসেবে যে নামটি উচ্চারিত হয়, তিনি হলেন বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)। ঢাকা বোর্ড থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে তিনি পঞ্চম হয়েছিলেন। তাঁর ইংরেজি খাতার পরীক্ষক খাতার পাশে লিখিত মন্তব্য করেছিলেন: `The boy is either mad or a genious' পরীক্ষকের এই মন্তব্যটি ছিল যথার্থ। বুদ্ধদেব বসু শুধু জিনিয়াসই নন, তিনি ছিলেন ভার্সেটাইল জিনিয়াস। তিনি সাহিত্যের সব শাখায় সমান সার্থকতার পরিচয় দিলেও রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি কবি। সমকালীন ঘটনাবলি, ব্যক্তিক সংকট ও জৈবনিক সংঘাতকে বুদ্ধদেব বসু তাঁর সাহিত্য রচনার অন্যতম বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছেন। তাঁর সৃজনশীল প্রতিভা বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে সপ্তম দশক পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করেছে আধুনিক জটিল মানুষের গতিশীল জীবনচেতনা ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ। আর এ সভ্যতার ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ সাধিত হয়েছে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠীর এবং ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। সভ্যতা যেখানে সামঞ্জস্য স্থাপনে ব্যর্থ, শিল্পকলার মাধ্যমেই সেখানে সামঞ্জস্যের সুর ধ্বনিত হতে পারে। বুদ্ধদেব বসুর মতে, 'শিল্পকলার মাধ্যমে আমরা অনুভব করি জগতের সঙ্গে সমানুকম্পন এবং ক্ষণিকের সঙ্গে শাশ্বতের মিলনস্পর্শ।' সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে যখন মানুষের চেতনায় বিচ্ছিন্নতার দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে, তখন বুদ্ধদেব বসুর কাব্যিক প্রেম, প্রকৃতি, কালচেতনা, সমাজ সংলগ্নতা, নিঃসঙ্গতা, মৃত্যুভাবনা ইত্যাদি বিচিত্র বিষয় তাঁর কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছে যা আধুনিক যন্ত্রনির্ভর সভ্য সমাজে আজও প্রাসঙ্গিক। সঙ্গত কারণেই উপর্যুক্ত বিষয়টি আমার আলোচনার বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

এক

একজন জাত শিল্পী বলতে যা বোঝায় তার সমস্ত গুণাবলিই বুদ্ধদেব বসুর মধ্যে ছিল। সৃষ্টিপ্রেরণার স্বরূপ সন্ধান এবং এর উৎস রহস্য উদঘাটন নিঃসন্দেহে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বুদ্ধদেব বসু এই চ্যালেঞ্জকে তাঁর জীবনের অন্যতম সঙ্গী মনে করে নিরন্তর করে গেছেন সাহিত্যের সাধনা। কবিতাকে তিনি মনে করেছেন তাঁর পথ চলার সাথী, বেঁচে থাকার অনুপম প্রেরণা, দুঃখে বিনোদনের অনাবিল উৎস। কবিতার বিষয় সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সদা সতর্ক। নারীভাবনা, প্রেমচেতনা, মৃত্যুচিন্তা, প্রকৃতি চিন্তা, বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রভৃতি বুদ্ধদেব বসুর কবিতার প্রধান বিষয়। কবিতার বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি কখনো হাত বাড়িয়েছেন পাশ্চাত্য সাহিত্যের দিকে, আবার কখনো দেশীয় ধ্রুপদী সাহিত্যের দিকে– কিন্তু ভাষার দৈন্য তাঁর কোনোদিনই ছিল না। এ কারণে তাঁর কাব্যে অনুকরণের কালিমা লেপন কখনোই হয় নি বরং তা ছিল স্বকীয়তায় ভাস্বর। এই স্বকীয়তা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বুদ্ধিবিলাস আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যের মর্মকথা। আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যের প্রসঙ্গটি আসলেই যে নামটির কথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলে আসে, তিনি হলেন মাইকেল

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

মধুসূদন দত্ত। বাংলা কাব্যে মধুসূদনের সবচেয়ে বড় অবদান— বিদ্রোহ ও গতিবেগ। মাইকেলের এই সহজাত বিদ্রোহ সম্পর্কে প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক হুমায়ুন কবির এর নিম্নোক্ত মূল্যায়নটি উদ্ধৃত করছি: "মাইকেলের কাব্যের এই সতেজ বিদ্রোহ ও গতিবেগের সামাজিক কারণ সহজেই বোঝা যায়। ইয়োরোপের সংস্পর্শে সেদিন হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণীর সম্প্রসারণের যুগ, এবং সে সম্প্রসারণের গতি সমাজ-সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। ইয়োরোপের আদর্শের প্রখরতায় তাই সেদিন হিন্দুমানসও বিহ্বল এবং সেই প্রথম পরিচয়ের বিস্ময় ও উল্লাসের মধ্যেই মাইকেলের কাব্যধারার জন্ম।"[১] মাইকেল মধুসূদনের মানস-ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তার অন্তরালে রয়েছে হিন্দু বাঙালির সুদীর্ঘকালের সমাজ-সত্তার ধারাবাহিক ইতিহাস। অনিবার্য ইতিহাসের এই ধারাবাহিকতা প্রভাবে বাংলা কাব্য নিয়তই বদলিয়েছে তার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য। আধুনিক বাংলা কাব্যের শরীরে এই পরিবর্তনের প্রথম বীজটি রোপিত হয়েছিল মাইকেল মধুসূদনের হাতেই। সমালোচকের ভাষায় বলা যায়, "তাই কেবল মাত্র কাব্যরীতিতেই বিপ্লবী নন, কাব্যের বিষয়বস্তু এবং দৃষ্টিভঙ্গীতেও তিনি সমানই বিপ্লবী। সনেট, নাট্যভঙ্গী ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ এ নতুন রচনারীতির বহিরাবরণ, কিন্তু চরিত্র চিত্রণ ও আদর্শ বিপর্যয় তার মর্মকথা।"[২] বাঙালি চরিত্রের সংগঠন ও ইউরোপীয় প্রভাবের পারস্পরিক উপযোগিতার মধ্যেই উনিশ শতকের সম্ভাবনার অকাল অবসানের বীজ লুকিয়ে ছিল্ বাঙালির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে এসে মিলল ইউরোপীয় বুদ্ধিবিলাস এবং তার ফলে ব্যক্তিচেতনার যে সূক্ষ্ম ও উগ্র পরিণতি তার অস্তিত্ব খণ্ডিত হয়েছিল বিভিন্ন বৈরী ও প্রতিকূল পরিবেশের কারণে। ইউরোপের আগমনে সমাজে অর্থনৈতিক কাঠামোর যে রূপান্তর, সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সংঘাতে চিরাচরিত সমাজব্যবস্থা নড়ে উঠেছিল। বাঙালির সেই স্বাতন্ত্র্যবোধ রূপান্তরের অনিবার্য পরিণতিতে কতকগুলো অনুভূতির সমষ্টিতে পরিণত হয়। বাঙলার সাম্প্রতিক কাব্যে তার প্রতিক্রিয়া অনস্বীকার্য এবং সে প্রভাব এত প্রবল যে তাকে বিপ্লব না বলে উপায় নেই। এই কারণে আধুনিক বাংলা কাব্যে মাইকেল মধুসূদনের প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। তিরিশের নতুন কবিতার অনন্য কবিব্যক্তিত্ব হিসেবে যে নামটি সর্বাগ্রে উচ্চারিত হতে বাধ্য তিনি বুদ্ধদেব বসু ছাড়া আর কেউ নন। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিতা আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা এ কবি পেশাগত প্রয়োজনে ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশ-বিদেশ। বিশ্বজোড়া বিশ্বসাহিত্যের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর ছিল সম্যক ধারণা। বুদ্ধদেব বসুর মনন ও চৈতন্যের বিশিষ্টতা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত প্রতিবেশ ও পরিচিতি সম্পর্কে সচেতন থেকেই সামনে এগুতে হবে। বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্যটি খুবই প্রাসঙ্গিক মনে করি:

> সমকালীন কবি সমালোচকগণ মূলত বিদেশি সাহিত্যের পাঠ ও সমালোচনায় উৎসাহী হলেও তাঁর হৃদয় জুড়ে ছিল স্বদেশ ও সংস্কৃতি। তাই সমকালে পরিণত ও নতুন কবিদের কাব্যপাঠ ও সমালোচনামূলক নিবন্ধ রচনার মাধ্যমে দেশীয় সাহিত্যে গতি-প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করেছেন তিনি।[৩]

আর এই দেশীয় সমাজবাস্তবতাই তাঁর কবিতার প্রাণ। প্রকৃতি আবহমান বাংলার এক অপরিহার্য উপাদান। ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির কবি হিসেবে অভিধা পেয়েছেন। এসব পরিচয়ে

বুদ্ধদেবের সহজ বুদ্ধিতে সংশয় লাগে। তিনি প্রশ্ন রাখেন 'প্রকৃতির কবি কোন কবি নন?' প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্য কখনো কখনো সাড়া তোলে না এমন মন সাধারণের মধ্যেও বিরল। প্রকৃতির মাঝে জীবন্ত ও সর্বব্যাপী এক সত্তার সন্ধান পেয়েছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ। তাই তাঁকে প্রকৃতির কবি বলা খুবই প্রাসঙ্গিক। কিন্তু এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর অভিমত, প্রকৃতির উপলব্ধিগত তীব্রতা শেলির কাব্যেই বেশি মাত্রায় পরিস্ফুট। এ বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য:

> তবে একরকম বিবেচনায়, সব কবিই প্রকৃতির কবি হলেও সবাইকেই ও-আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ সকলের পক্ষেই একমাত্র কিংবা প্রধান বিষয় নয়। অনেক কবির পক্ষেই প্রকৃতি মানবজীবনের নানা অভিজ্ঞতার পটভূমিকামাত্র; অনেকের পক্ষে ইন্দ্রিয়ের বিলাস। আবার কারো কারো পক্ষে মানবমনের অবস্থার প্রতিরূপমাত্র।[৪]

কবিতা অনেকেই লিখতে পারেন, কিন্তু কতজন প্রকৃত কবি হতে পেরেছেন? এ সংখ্যা হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র। জীবনানন্দের ভাষায় যা বলা যেতে পারে—'সকলেই কবি নয়-কেউ কেউ কবি।' বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'জীবনানন্দ দাশ: ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রবন্ধে বলেন:

> প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে অনুভব না করেন এমন কোনো কবি নেই; কিন্তু সমগ্র জীবনকে প্রকৃতির ভিতর দিয়েই গ্রহণ ও প্রকাশ করেন এমন কবির সংখ্যা অল্প। তারাই বিশেষভাবে প্রকৃতির কবি।[৫]

প্রকৃতির কবি নিসর্গ বা প্রকৃতিকে জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচিত করেন। অনেক সময় প্রকৃতি কবির জীবনের সাথে একীভূত হয়ে যায়। কবিমানস আর প্রকৃতি তখন মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। কবিতায় প্রাকৃতিক বা নৈসর্গিক উপাদান মানসশক্তির সংস্পর্শে আসার পর তার স্বতঃস্ফূর্ত সঞ্চালনে আবেগস্নাত হয়ে সেখানে নান্দনিক অভিপ্রায় সংযোজিত হয়। কবি বাইরের জিনিসকে আত্মচেতনা দ্বারা শৈল্পিক শব্দরাশি দ্বারা প্রকাশ করে তাতে প্রাণ সঞ্চার করেন। প্রকৃতিকে আশ্রয় করে কবি অনেক গভীর ভাবকে খুব সহজেই সাবলীল ভাবে আত্মচেতনার রঙ লেপন করে প্রকাশ করে থাকেন। আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতায় শোক-তাপদগ্ধ পৃথিবীর ভেতর থেকে তাঁর নিসর্গচেতনা পৃথিবীর বাস্তবতায় নিমজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। জীবনের বিচিত্র বিষয়কে তিনি কবিতার মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন। কবির ভাষায়:

> জ্যোৎস্না ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে দরজায়
> চারিদিকে যতোগুলি দরোজা আছে সময়ে নীলিমার পাতালের
> জ্বলেছে গাছের সকল সবুজ মশাল, বাস একটি নক্ষত্র, পুলিশ
> একটি নক্ষত্র , দোকান একটি নক্ষত্র, আর সমস্তের উপর
> বরফ পড়ছে। (অশোক কানন)[৬]

আধুনিক কবিতা আজকে এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছে যেখান থেকে আর অতীতে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয় কোনো ক্রমেই। আধুনিকতাকে আমরা যতই দুর্বোধ্য আর প্রহেলিকাময় বলে অভিহিত করে থাকিনা কেন, এ জাতীয় কবিতার উপমার ভেতরে এক ধরনের প্রাণ আছে যা রবীন্দ্রকাব্যে অনুপস্থিত। বিশেষত, কবিতার উপমাচেতনায় পাওয়া যায় অনন্য এক আস্বাদ। ভূতের মতো জ্যোৎস্না দাঁড়িয়ে থাকে দরজায়, গাজের সবুজ মশাল জ্বলে উঠেছে; বাস, পুলিশ, দোকান যেন এক একটি নক্ষত্র । এ কবিকল্পনা একজন

আধুনিক কবির মনন থেকেই উৎসারিত। বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় উদার গ্রামীণ নিসর্গের রূপচিত্র যেমন তাঁর মনোভাবকে বহন করে, নাগরিক নিসর্গও তাঁর মনোভাবের বাহক। ছেলেবেলার প্রথম যৌবন তাঁর প্রকৃতির অপূর্ব ভাণ্ডার পূর্ববঙ্গে কাটলেও তাঁর অবশিষ্ট দীর্ঘজীবন কেটেছে কলকাতার নগর জীবনে। বুদ্ধদেব বসুর কাব্যে তাই উভয় বাংলার প্রভাব সুস্পষ্ট। তিনি যে সময়ের কবি, সে সময়ে একদল তরুণ কবি রবীন্দ্র বলয় থেকে বাংলা কাব্যকে উদ্ধারের প্রাণপণ চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। বুদ্ধদেব ছিলেন তাঁদের অগ্রণী সদস্য। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত মন্তব্যটি উদ্ধৃত করছি:

> ত্রিশোত্তর কবিযশোপ্রার্থীরা প্রথম যৌবনেই বুঝেছিলেন যে, রবীন্দ্রবলয় থেকে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে হলে শুধু বিষয়বস্তু ও প্রকরণে অভিনবত্ব খুঁজলে চলবে না, কাব্যের পটভূমি পরিপ্রেক্ষিতের অভিনবত্বও প্রয়োজন। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিরা কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতভূমির পরিবর্তন করলেন।[৭]

প্রকৃতি কবিতার অপরিহার্য উপাদান। কবির চারপাশ প্রকৃতিবেষ্টিত, তা গ্রামীণ বা নগরপ্রকৃতি, যাই হোক না কেন।

> রাস্তায় গাড়ির শব্দ, তার পরে চাবুকের শিষ,
> মুহূর্তের নীরবতা– আবার সে চাকার ঘর্ঘর,
> ঘোড়ার খুরের খট্‌খট্‌।
> তারচেয়ে স্পষ্ট তার পদধ্বনি কাঠের সিঁড়িতে,
> আরো স্পষ্ট– আরো স্পষ্ট – দ্রুত শব্দ, দ্রুত পদক্ষেপ;
> উৎসুক হাতের ঠেলা– খুলে গেছে বন্ধ ভেজানো দুয়ার।
> প্রথমে ফুলের গন্ধ–বায়ু তারে করিছে লেহন,
> আবার চুলের গন্ধ-বাতাস কি এখনো বহিছে?
> একটি সোনালি সুতা এলায়ে পড়েছে মোর কাঁধে,
> ছড়ায়ে গিয়েছে মুখে– চোখে– ঠোঁটে রাশীকৃত সোনা;
> তারপর কণ্ঠ ঘিরি কুন্দশুভ্র দুইটি হাতের
> কোমল উত্তাপ,
> দশটি পরীর মতো দশটি আঙুল মোর বুকে।[৮]

কবি চমৎকারভাবে মানব অঙ্গের সৌন্দর্যের সাথে প্রকৃতির সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন। আর প্রকৃতির এই সৌন্দর্য শহুরে জীবনের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। কবির প্রাকৃতিক জীবনের উষ্ণতা নাগরিক উষ্ণতায় বিকৃত না হয়ে ভিন্নতর সৌন্দর্যে রূপান্তরিত হয়েছে চমৎকার উপমাভাষ্যে। প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রান্তরে ফুলের এক রকম সৌন্দর্য, আবার নাগরিক পরিবেশে ফুলের টবে তারও এক প্রকার সৌন্দর্য রয়েছে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর কাব্যে প্রকৃতিকে নাগরিক জীবনের যন্ত্রণাকাতরতার মাঝেও অনন্য জীবনদায়ী করে তুলে ধরেছেন তাঁর অপূর্ব কবিসক্ষমতায়। তিনি আর দশজন কবি থেকে আলাদা-চিরায়ত পথে তিনি হাঁটেন না। সমালোচকের মন্তব্যে তার প্রমাণ মেলে:

> আধুনিক বাংলা কবিতায় শুদ্ধীকৃত শোণিত ও উজ্জীবিত প্রাণময়তা সঞ্চারে তরুণ কবিদের প্রথাবিবাদী শব্দানুসন্ধান বরাবরই যে একটা চমকপ্রদ ভূমিকা নিয়েছে তার নিদর্শন বুদ্ধদেব বসুর কবিতাতেও আছে। ...তাঁর কিছু কিছু অভ্রান্ত শব্দ সত্যিই কবিকে দিয়েছে মৌলিক কণ্ঠ, কবিতার শরীরে বাজিয়েছে নতুন ঘণ্টাধ্বনি।[৯]

আধুনিক বাংলা কাব্যে বুদ্ধদেব বসুর *যে আঁধার আলোর অধিক* কাব্যখানি ব্যতিক্রমী সংযোজন। এই কাব্যে কবি প্রকৃতিকে তুলে ধরেছেন অসীম উচ্চতায়। এ কাব্যের মূল বিষয় এখানে তুলে ধরছি: প্রকৃতি হল অফুরন্ত, অসম্পূর্ণ সম্ভাবনাপুঞ্জ, আর শিল্প– অমোঘ, কৃত্রিম, অব্যর্থ রূপকার; যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে সর্বত্র পড়ে থাকে, তাকেই পরিমার্জিত ও রূপান্তরিত করে শিল্প এবং এই দিক থেকে শিল্প শুধু প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র নয়, গুণগতভাবে উৎকৃষ্টও বটে। কবি যখন বলেন:

প্রান্তরে কিছুই নেই; জানালায় পর্দা টেনে দে।
ওরা কেবল তোকে ভোলাতে চায়— ঘাস, মাটি, পুকুর, আকাশ;
ফেলে দে পুতুল, ফুল, পোষা পাখি, শৌখিন ক্যাকটাস;
ডুবে যা নিরভিমান, একতাল, বিশ্বস্ত নির্বেদে।[১০]

একই কাব্যগ্রন্থের 'ঋতুর উত্তরে' কবিতায় বুদ্ধদেব বলেন:

আমার হৃদয় আজ চিরন্তন হেমন্তে বিলীন;
কুয়াশা, চাঁদের প্রেত, রশ্মি-জ্বলা পশ্চিমের স্মৃতি—
সব মিশে অন্ধকারে ভ'রে দেয় আলোর পুলিন।[১১]

আধুনিক কবিতার প্রকৃতি মধ্যযুগীয় নিষ্প্রাণ প্রকৃতি নয়, বরং তা প্রাণময় ও সচল প্রকৃতি। আধুনিক কবি প্রকৃতিতে আরোপ করেন প্রাণময়, সজীব, চঞ্চল সত্তা। বুদ্ধদেবসহ ত্রিশোত্তর অন্যান্য কবিরাও প্রকৃতিকে সজীব-চঞ্চল করেই অঙ্কন করেছেন। সমালোচকের ভাষায়:

> বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় উদার-বিস্তৃত নিসর্গের শোভা যেমন ফুটেছে, তেমনি নাগরিক প্রতিবেশ আবেষ্টনীয় সেখানে উপস্থিত। তাঁর মানস-প্রকৃতি আদ্যন্ত আকাশকে অবলম্বন করেছে। আকাশ, নক্ষত্রপুঞ্জ-আলো-অন্ধকার-চাঁদ-পাখি-এইসব রোমান্টিক উপাদান প্রথম পর্যায়েরে রচনায় তাঁর অভিনিবেশ অধিকার করেছে। বুদ্ধদেব বসু নিজে নাগরিক প্রকৃতির রূপায়ণ করলেও স্বস্তি অনুভব করেন উন্মুক্ত প্রাকৃতিক প্রতিবেশে– অবারিত আকাশ, জ্যোৎস্না ও বনভূমিতে। নগরেও তিনি অন্বেষণ করেন নাগরিক বস্তুস্রোতের মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।[১২]

চমৎকার ভাষাবিন্যাসে কবি প্রকৃতিকে তুলে ধরেছেন। অসাধারণ দক্ষতায় কবি প্রকৃতির ধারাভাষ্য রচনা করেছেন। প্রকৃতির প্রবল প্রতিবেশিতার তাপ, এমনকি, স্বল্প সংবেদনশীলরাও সাধারণভাবে অনুভব করেন; কবির স্পর্শকাতরতা সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি। বহির্জাগতিক প্রকৃতি সাধারণভাবে নিশ্চেতন ও নির্জীব— তার উপস্থিতিতে কোনো বিশেষ বাণী বা অর্থের সৃষ্টি হয় না। আধুনিক কবি এই সাধারণ প্রকৃতিতে আরোপ করেন বিশেষ গুণ বা অবস্থা। এর ফলেই প্রকৃতি বিভিন্ন কবির ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা লাভ করে থাকে। কবির এ ভিন্ন মাত্রিক বর্ণনার এক নমুনা তুলে ধরার প্রয়াস পাব উইলিয়াম মরিস এর কবিতা অনুসরণে রচিত 'মধ্য-রাত্রে' কবিতাটির মধ্যে:

ভাবিয়ো আমার কথা একবার তারাভরা আকাশে তলে,
কহিয়ো আমার নাম একবার নিশীথের বাতাসের কানে;
নয়ন তুলিয়া তব চাহিয়ো একটিবার আকাশের পানে,
একবার মুখ তুলে ডাকিয়ো আমার নাম বাতাসের কানে।

আকাশে তারার ভিড়, আকাশে রূপার রেখা বাঁকা চাঁদ জ্বলে;
রজনী গভীর হয়; বাতাসে মদির গন্ধ; চাঁদ পড়ে ঢ'লে—
চাঁদের রূপালি রেখা লাল হ'য়ে লাল হয়ে ঢ'লে পড়ে পশ্চিমের কোলে।[১৩]

বুদ্ধদেব বসুর প্রকৃতি বিষয়ক কবিতার আলোচনায় প্রেমের প্রসঙ্গটি অনিবার্যভাবেই এসে যায়। কারণ তিনি প্রেম আর প্রকৃতি চেতনার মাঝে কোনো পার্থক্য রাখেন নি। উপরিউক্ত পঙক্তিমালায় কবির প্রকৃতিপ্রেমের অবিশ্বাস্য পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতিকে তিনি কখনো দেখেছেন তাঁর সৌন্দর্যপ্রিয়া হিসেবে অথবা আবার দেখেছেন বাস্তবের দারুণ কষাঘাতে জর্জরিত হতে। 'স্বাগতবিদায়' কাব্যের নাম কবিতায় কবির প্রকৃতির প্রতি অকৃত্রিম পরিচয় ফুটে উঠেছে:

কোন দূর সন্ধ্যায়বারান্দা বেয়ে আলাদিন জ্বালায় প্রদীপ।
এপারে ব্রুকলিন, আর ওপারে মানহাটান, স্কাইলাইন,
মধ্যিখানে বন্দর, অর্ণবপোত, সেতুর চিত্রল ভঙ্গি,
উড্ডীন আশার মতো ইতস্তত হেলিকপ্টার।
আছি হোটেলের ঘরে, এতদিনে অভ্যস্ত, নিজস্বপ্রায়;
ঋতু গ্রীষ্ম, তরুণ সুন্দর জুন, জানালায় সমুদ্রসমীর—
জুন, কিন্তু আসন্ন আষাঢ়।[১৪]

আধুনিক শিল্পভাবনার অন্যতম বিশিষ্ট কবি বুদ্ধদেব বসু। কবিতার চিত্রকল্প নির্মাণে তিনি নিজের অনুভবকে একটু বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, কিন্তু তাতে চিত্রকল্পের রমণীয়তা নষ্ট হয় না। প্রকৃতি বুদ্ধদেবের কবিতায় ব্যাপকভাবে এসেছে। বুদ্ধদেব বসু সাহিত্যে আধুনিকতার রূপদ্রষ্টা একজন শিল্পী হয়েই তাঁর কবিতায় বাংলাদেশের মানুষ, মানুষের প্রেম ও প্রকৃতিকে কবিত্বের চিরায়ত ভূবনে স্থান দিয়েছেন। তাঁর প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা প্রকৃতির সৌন্দর্যের সাবলীলতাকে ধারণ করেই ভাবের গাম্ভীর্যে প্রগাঢ় এবং শিল্পব্যঞ্জনায় প্রসন্ন ও স্নিগ্ধ। বুদ্ধদেব শীত, গ্রীষ্ম, বসন্ত, ও বর্ষার ঋতুবৈচিত্র্যের দর্পণে আত্মভাবনার প্রতিফলন লক্ষ্য করে কবিতায় তাকে প্রকাশ করে বলেন:

শীত, গ্রীষ্ম, বসন্ত, বর্ষার দিন, আমি এতদিনে
তোমাদের বিরাট খামখেয়াল জয় করে, হৃদয়সন্ধ্যায়
নিয়েছি সুযোগমুক্ত, হতভাগ্যশূন্যতারে চিনে—
আমি, মৃত, নিশ্চিত, ভবিষ্যময়, প্রশ্নের অতীত।
পউষে- ফাল্গুনে-গাঁথা কান্না-হাসি-দোলানো অন্যায়
আমারে বেঁধে না আর।[১৫]

ঋতুচিত্রণে বুদ্ধদেব বসু স্বাভাবিক পরিবেশের আশ্রয় নিয়েছেন। বিশেষত বর্ষার সজল প্রকৃতির শ্যামলতায় ধরণী যেন সবুজাভ রূপের বন্যায় পরিপূর্ণ হয়। বর্ষণমুখর ঋতুর এরূপ জলদগম্ভীর শব্দতরঙ্গের প্রভাবে প্রকৃতির যে পরিবর্তন তাতে প্রাণিকুল নবধারার স্পর্শে উল্লসিত হয়, বায়ুমণ্ডলে আর্দ্রতা আসে এবং শীতল বায়ুপ্রবাহে মাটির পৃথিবীর ধূসর রুক্ষতা অপসারিত হয়। সমালোচকের নিম্নোক্ত মন্তব্যটি বুদ্ধদেব বসুর প্রকৃতিচেতনা বিষয়ে খুবই প্রাসঙ্গিক:

বুদ্ধদেব বসু বাংলাদেশের প্রকৃতির চিত্ররূপময় উপস্থাপনাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে ঋতুই যে, প্রকৃতির বিকাশের একমাত্র উৎস, একথাটি তিনি বিস্মৃত হন নি। সেই সূত্রে কথাটি বলা অসঙ্গত নয় যে বাংলাদেশের প্রকৃতির প্রাণের স্পন্দন আনে এদেশের ষড়ঋতু; এবং প্রকৃতির উপস্থিতিকে প্রাণময় করে তোলে ষড়ঋতু।[১৬]

দুই

প্রেম বুদ্ধদেব বসুর কাব্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রসঙ্গ। অনেক সমালোচক তাঁর প্রেমের কাব্যে দেহবাদী চেতনার প্রভাব লক্ষ করেছেন। বিশেষত বুদ্ধদেব বসু তাঁর কাব্যে দেহবাদী ইন্দ্রিয়চেতনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে ডি. এইচ লরেন্সের কাছে প্রেরণা পেয়েছেন। প্রেমের কবিতায় রবীন্দ্রবলয় থেকে স্বাতন্ত্র্য-প্রত্যাশী বলেই তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্যে চিত্রিত ইন্দ্রিয়চেতনার আশ্রয় নিয়েছেন। মানসিক ও শারীরিক স্পর্শকাতরতার প্রাবল্য লরেন্সকে যৌন আবেগের দিকে তাড়িত করেছে। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর মানসিক ও শারীরিক শুচিতাবোধের সঙ্গে, মার্জিত রুচি ও সংস্কারাবেগের সঙ্গে লরেন্সের চারিত্রিক সাদৃশ্য সামান্যই। লরেন্সের মানসপ্রবণতা উবলব্ধির জন্য তাঁর 'Manifesto' কবিতার কিছু পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করছি:

But then came another hunger
very deep, and revening;
the very body's body crying out
with a hunger more frightening, more profound
than stomach or throat or even the mind;
redder than death, more clamorous,
the hunger for the woman. Alas,
it is so deep a Moloch, ruthless and strong,
its like the the unutterable name of the dread Lord
not to be spoken aloud.
Yet there it is, the hunger which comes upon us,
which we must learn to satisfy with pure, real satisfaction;
or perish, there is no alternative.[১৭]

[Manifesto, D. H. Lawrence]

'Manifesto' কবিতায় ডি. এইচ. লরেন্স ক্ষুধাকে বলেছেন: 'Hunger is the best satan'-এ কবিতায় লরেন্স খাদ্য, পানীয় এবং মানসিক ক্ষুধার অতিরিক্ত অন্যতর এক ক্ষুধার বর্ণনা দিয়েছেন, বিশেষত আরো সর্বগ্রাসী, আরো গভীর ক্ষুধা হল নারী ও নারীদেহের জন্য ক্ষুধা। লরেন্সের কবিতায় যৌনক্ষুধার প্রবলতর উপস্থিতি ও উচ্চকিত শরীরী প্রেমের ঘোষণা সাহিত্য-ঐতিহ্যে লালিত মার্জিত সুরুচিসম্পন্ন, পরিশীলিত বুদ্ধদেব বসুর পুরনো মূল্যবোধকে বিপর্যস্ত করেছে। কাব্যাদর্শের সন্ধানে বুদ্ধদেব বসু শুধু বিদেশী সাহিত্য-ঐতিহ্যের দিকে ধাবিত হয়েছেন, একথা মনে করার কারণ নেই। মাতৃভাষার সাহিত্য-ঐতিহ্য এবং সমকালের সাহিত্যও ছিল তাঁর অধিগত। রবীন্দ্র প্রভাব এড়ানোর প্রচেষ্টায় তরুণ বয়সেই তিনি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, গোবিন্দ চন্দ্র দাস, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় কাব্যাদর্শের সন্ধান করেন। বুদ্ধদেব বসু

প্রেমের মূলপ্রেরণা— যৌনলিপ্সাকে সগৌরবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, কবিতায় প্রতিষ্ঠা করেছেন দেহবাদী সম্ভোগ-সংরাগ। কিন্তু পরিণামে তিনি দেহাতীত প্রেমকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। বুদ্ধদেব বসুর প্রেমচেতনা সম্পর্কে অমলেন্দু বসুর নিম্নোক্ত মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য:

> প্রেমের আবরণ মানবিক। প্রবৃত্তির যে অবিচ্ছেদ্য কারাগারে নির্মম বিধাতা বন্দী করেছেন মানুষকে, নিছক যৌনপ্লিসার সে কারাগার থেকে সুকুমার আবেগ অনুভবের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসকেই বলি প্রেম নামক সভ্য চিত্তবৃত্তি। অন্যান্য আরো কতকগুলি আদিম প্রবৃত্তির সঙ্গে মার্জিত তদনুরূপ চিত্তবৃত্তিগুলির যে সম্পর্ক, প্রেম ও তার মূল যৌনবোধে সে সম্পর্কই বিদ্যমান। মূলকে ভুলে যাওয়া তেমনই অবাস্তব যেমন মূলেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকা। শিকড় ছাড়া গোলাপ ফোটে না, কিন্তু গোলাপ শিকড়ও নয়। প্রেমে যৌনচেতনার পরম রূপান্তর। যদি এ রূপান্তরের কৃতিত্ব দিই মানুষকে, তাহলে বুদ্ধদেব বসুর অনুসরণে বিনা দ্বিধায় বলব, স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্ট-র মাহাত্ম্যই অধিক।[১৮]

অমলেন্দু বসু 'বন্দীর বন্দনা', 'শাপভ্রষ্ট', 'কালস্রোত', ও 'অমিতার প্রেম'— এই চারটি কবিতার মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন:

> উপরোক্ত কবিতা চারটির পুনরাবৃত্ত শব্দগুলি থেকে বুঝতে পারি কবিচিত্ত এখন প্রবৃত্তিপরবশ, তীব্রভাবে দেহচেতন, আবার সেইসঙ্গে দেহোত্তীর্ণ শুভ ও সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল আর সর্বোপরি দেহমগ্ন প্রবৃত্তিতে ও বিদেহী সৌন্দর্যস্পৃহায় অনুত্তরণীয় বিরোধ লক্ষ করার ফলে তাঁর অনুভূতি মর্মান্তিক দোটানায় বিক্ষুব্ধ। যে পরিমাণে দেহ-চেতনা বিদেহী চেতনাকে ক্লিষ্ট করেছে সে পরিমাণে দেহ-চেতনা তাঁর পক্ষে কুশ্রী ও ক্লেশকর।[১৯]

বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যে তাঁর কবিমানসের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। বুদ্ধদেব রাগ-রক্তিম যৌবনের কবি। নরনারীর যৌনসত্তার অনুপম ব্যঞ্জনা প্রকাশিত হয়েছে এই কাব্যে। বিধাতা প্রদত্ত যৌন বাসনাকে আচ্ছন্ন করে রেখে কবি কোনো কিছু সৃষ্টি করতে আগ্রহী নন:

> বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
> দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
> রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ উপবাসী শৃঙ্গার কামনা
> রমণী-রমণ-রণে পরাজয় ভিক্ষা মাগে নিতি;—
> তাদের মেটাতে হয় বঞ্চনার দুর্দম বিক্ষোভ।[২০]

বুদ্ধদেব বসু প্রেমকে মোহনীয় ও উপভোগ্য করে তুলেছেন তাঁর কাব্যে। প্রেমহীন জীবন কোনো জীবন নয়। প্রেমবঞ্চিত মানুষ বড় হতভাগ্য। প্রেমকে জীবনে একান্ত করে পাওয়ার জন্য মানুষের অনন্ত প্রচেষ্টা। সুতরাং এই প্রেমকে অবদমনের চেষ্টা মূলত আত্মঅবদমন। আর আত্মদমনের মধ্যে রুচিশীলতার কোনো ছাপ নেই, বরং প্রেমের শৈল্পিক বিকাশই ইতিবাচক মনোবৃত্তির লক্ষণ। কাজেই বুদ্ধদেব তাঁর কাব্যে প্রেমের যে বহুমাত্রিক সন্নিবেশ ঘটালেন তাতে বাহুল্যের কোনো চিহ্ন নেই। সমালোচক তাঁর এই বৈশিষ্ট্যের মূল্যায়ন করেছেন এভাবে:

> বুদ্ধদেব বসু ত্রিশোত্তর আধুনিক কবিতার প্রধান পুরুষ, যিনি প্রেমের কবিতায় বাসনার অলজ্জ ও নিষ্কুণ্ঠ প্রকাশ ঘটালেন। বিধাতাসৃষ্ট মানুষের আদিম প্রবৃত্তি ও যৌনকামনার

প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁর কবিতায় অবলীলায় রূপায়িত। এর সঙ্গে কামনা থেকে প্রেমে উত্তরণের ঘোষণাও শোনা গেলো তাঁরই কবিতায়।[২১]

কঙ্কাবতী কাব্যের 'মেয়েরা' কবিতায় প্রকৃতিকে দেখতে পাই জলজ্যান্ত এক নারীরূপে— যে নারী হেঁটে যায় পুরুষের গা ঘেঁষে, ফেলে যায় গায়ের সুবাস। প্রকৃতির বাতাসে নারীর শরীরের গন্ধ ভাসে। পুরুষের মন উতলা করে দেবার মতই সে ঘ্রাণ। এ ঘ্রাণের জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রতিটি পুরুষের। কবি বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় প্রসঙ্গটি যেন ফুটে উঠেছে বাস্তব মূর্তি নিয়ে:

গা ঘেঁষে মেয়েরা চলে, ফেলে যায় গায়ের সুবাস,
বাতাসে সুবাস ভাষে–গায়ের বাতাস।
আঁচল হাওয়ায় নড়ে, আঁচলে ঢেলেছে ওরা একটু আতর
হাওয়া তাই ভুর ভুর করে,
জ্বলেছে নতুন চাঁদ, ঝিলমিল ক'রে ওঠে পাৎলা কাপড়,
হাওয়ায় হঠাৎ যায় স'রে।
গা ঘেঁষে মেয়েরা চলে, কথা কয় ঢেউয়ের ভাষায়,
ছোঁয় কি না ছোঁয় মোর ছায়া!
যে হাওয়া ছুঁয়েছে তারা, সেই হাওয়া ঝরে মোর গায়,
বিছায় সুরভি– ঘন মায়া।[২২]

প্রেমের কবিতায় বুদ্ধদেব বসু বিশুদ্ধ অনুভূতির রূপকার হলেও তাঁর কবিতায় আবেষ্টনী-চেতনার প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রেমের কবিতার সঙ্গে জীবনানন্দ দাশ ইতিহাস-বোধ ও বিষ্ণু দে রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বুদ্ধদেবের প্রেমের কবিতায় এ দুয়ের কোনোটিই নেই, তবু বিশুদ্ধ অনুভূতির রূপকার হতে গিয়ে বুদ্ধদেব তাঁর প্রেমের কবিতাকে নিরবলম্ব করে তুলেন নি। পাত্র-পাত্রীকে তিনি বাস্তবতার পাথরে নির্মাণ করেছেন। তাঁর পাত্র-পাত্রীরাও বাস্তবানুগ, তাই পৃথিবী-পরিপ্রেক্ষিত ভুলে যায় নি। *কঙ্কাবতী* কাব্যে কবি জীবনের এক বাস্তবতাকে সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। এই কাব্যের প্রথম কবিতার মধ্যে প্রেমিকার জন্য অপেক্ষাকাতর প্রেমিকের উদ্বেল হৃদয়স্পন্দন অনুভূত হয়, এক নাগরিক পরিপ্রেক্ষিতের সাক্ষাৎ মেলে। অনেক তুচ্ছ বিষয় হয়ে ওঠে অভাবনীয় মূল্যবান:

রাস্তায় গাড়ির শব্দ, তার পরে চাবুকের শিস,
মুহূর্তের নীরবতা- আবার সে চাকার ঘর্ঘর,
ঘোড়ার খুরের খটখট।
তার চেয়ে স্পষ্ট তার পদধ্বনি কাঠের সিঁড়িতে,
আরো স্পষ্ট-আরো স্পষ্ট-দ্রুত শব্দ, দ্রুত পদক্ষেপ;
উৎসুক হাতের ঠেলা-খুলে গেছে ভেজানো দুয়ার।
প্রথমে ফুলের গন্ধ-বায়ু তারে করিছে লেহন,
আবার চুলের গন্ধ-বাতাস কি এখনো বহিছে?[২৩]

প্রেম ছিল বুদ্ধদেব বসুর আজীবন আরাধ্য। তাই বাইরের পৃথিবী ও জ্ঞানের বেদনাকে তিনি ভুলতে চেয়েছেন প্রেমঘন আলিঙ্গন ও সম্ভোগে নিমজ্জিত হয়ে। অসাধারণ কোনো নারী নয়,

যে কোনো সাধারণ নারীই কবির প্রয়োজনের সঙ্গী হতে পারেন। সাধারণ নারীই তাঁর কাম্য। 'দ্রৌপদীর শাড়ি' কাব্যে কবির প্রেমব্যঞ্জনা এক ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে। 'কালো চুল' কবিতায় কবির প্রেমাকাঙ্ক্ষা চমৎকার বাণীবিন্যাসে মূর্ত হয়েছে:

আজও তো মনে হয় মেঘ যেন নয়, কার চুল,
কার চুল, কালো চুল, এলো চুল,
কঙ্কাবতীর কালো চুল!
কঙ্কাবতী তার কালো চুল খুলে দিলো সন্ধ্যার সোনালী বারান্দায়,
স্বর্গের মায়াবী বারান্দায়,
লাল সূর্যাস্তের জানালায়;
লাগলো আলো চুলে, জাগলো উচ্ছ্বাস স্বচ্ছ সবুজের,
বিলোল হলুদের আগুনে বেগনির বিশ্রাম,
উষ্ণ বাদামির হৃদয়ে ধূসরের শান্তি,
রঙের অঙ্গনে আঁধার সন্ধ্যার শান্তি।[২৪]

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় চুলের ব্যাপক ও গভীর ব্যবহার ঘটেছে। চুল, চোখ, ঠোঁট—এইসব ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ উপাদান সম্পর্কে পাশ্চাত্য সাহিত্যের চেয়ে ভারতীয় সাহিত্য বেশি মনোযোগী। প্রেমপ্রসঙ্গকে প্রাণবন্ত করে তুলতে নারীঅঙ্গের বর্ণনা সাহিত্যে খুবই প্রাসঙ্গিক ব্যাপার। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বর্ণনাটি স্মর্তব্য:

> পাশ্চাত্য সাহিত্যে ইন্দ্রিয়ঘনত্ব ও দৈহিক রূপ সম্পর্কে চেতনার মাত্রা ভারতীয় সাহিত্যের তুলনায় বেশি। প্রাচ্যমানসে দেহকে অতিক্রম করার প্রবণতা সুপ্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। তবে 'চুল' ও 'চোখ' সম্পর্কে সচেতনতা ভারতীয়দের মানস-বৈশিষ্ট্য। চুল-চর্চার বর্ণনা সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে আছে। জীবনাচরণেও ভারতীয়রা কেশ ও কেশ-চর্চার নানা উপকরণ নিয়ে প্রাচীনকাল থেকেই ভেবে এসেছে।[২৫]

নারীর প্রতি নরের আকর্ষণ প্রাকৃতিক এবং সহজাত। মানুষের অনেক প্রসঙ্গ আছে যাকে যুক্তি দিয়ে, বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ দিয়ে বিচার করলে চলে না। বিচিত্র প্রভাবক যুক্ত হয়ে নর-নারীর আকর্ষণ উপভোগ্য হয়ে ওঠে। বাস্তব ও কল্পনার বর্ণনায় নরের নিকট নারী কিংবা নারীর কাছে পুরুষ হয়ে ওঠে পরম আরাধ্য ও প্রত্যাশিত। 'প্রেমের কবিতা' নামক কবিতায় সেই প্রসঙ্গটি কবি তুলে ধরেছেন:

এসো শুভ লগ্নের উন্মীল সমীরণ,
করো সেই অবিকল মন্ত্রের বিকিরণ,
যার অনুকম্পায় বেদনার অভিসার,
হয়ে ওঠে মিলনের কণ্ঠের মণিহার;
সেথা বৈজ্ঞানিকের বৃথা অণুবীক্ষণ।
—কিছু তার জৈব, কিছু তার দৈব।[২৬]

দ্রৌপদীর শাড়ি কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা 'স্বয়ংবরা'। একদিন শ্রাবণের ধারাজলের মতই অবিরল নেমে এসেছিল সুখ-স্বপ্ন মিলনের রাত। স্পর্শের বিদ্যুৎ হেনে শরীরী সংরাগ নিয়ে প্রেমিকা সে রাতে হয়েছিল স্বয়ংবরা। নির্বাচিত শব্দাবলিতে, সংহত

প্রকাশকলায়, মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সাংগীতিক ধ্বনি-কাঠামোয় 'স্বয়ংবরা' কবিতায় সেই প্রেমস্মৃতি মুখর হয়ে আছে। আজ আবার পৃথিবীতে নেমেছে শ্রাবণধারা। সেই শ্রাবণধারায় বিরহবেদনা আকাশজুড়ে ব্যাপ্ত হয়ে ওঠে:

বুকের পরে মোহ্যমান
বর্বরের তরল তান
স্মরণহীন দেশান্তরে
যদি বা দেয় ছাড়া
সেই আমার, সেই তোমার,
অজ্ঞতার প্রতিজ্ঞার
ব্যর্থতায় হঠাৎ পায়
আকাশময় সাড়া
আজ আবার যদি শ্রাবণ-ধারা।[২৭]

নারীদেহের অপরূপ সৌন্দর্য কবিকে বিমোহিত করে ফেলে। তাঁর বহু প্রেমের কবিতা নারীদেহের অনিন্দ্য সৌন্দর্যকে অবলম্বন করে। নারীর বিশেষ অঙ্গকে আশ্রয় করে কবির প্রেমচেতনা ডানা মেলেছে। তবে, তাঁর *রাত ভ'রে বৃষ্টি* উপন্যাসটি অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য— লেখক কীভাবে নরনারীর শারীরিক মিলনের বর্ণনা দিচ্ছেন তার ওপর কোনো গ্রন্থের পবিত্রতা বা অশ্লীলতা নির্ভর করে। এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে 'রাত ভ'রে বৃষ্টি'র প্রথম স্তবকটির ওপর দৃষ্টি ফেলা যায়। বুদ্ধদেব কাহিনীর নায়িকা সন্তানবতী মালতী, যে চার ঘণ্টা আগে পরপুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, তার বর্ণনাটি তুলে ধরছি:

> হয়ে গেছে— ওটা হয়ে গেছে— এখন আর কিছু বলার নেই। আমি, মালতী, মুখোপাধ্যায়, একজনের স্ত্রী আর একজনের মা, আমি ওটা করেছি। করেছি জয়ন্তর সঙ্গে, জয়ন্ত আমাকে চেয়েছে, আমিও তাকে। নয়নাংশু হয়তো ভাবছে আগেই করেছিলুম। কিন্তু না- আজই প্রথম। আজ রাতে চার ঘণ্টা আগে। এই বিছানায়।[২৮]

বুদ্ধদেব বসুর প্রিয় কবিদের একজন শার্ল বোদলেয়র । যৌনতার উজ্জ্বল নিবিড় বিবরণ দিয়ে কবিতায় তিনি তীব্র আবেদন সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। বুদ্ধদেব বসুও বোদলেয়র এর কাছে অনুপ্রেরণা নিয়ে নারীদেহের বিশেষ অঙ্গের চিত্র এঁকেছেন অনুপম বাণীবিন্যাসে। তবে তাঁর সাহিত্যে আদিরসের যে বর্ণনা আছে তা অশ্লীল নয়, যে নজীর উপস্থাপন করা হয়েছে তা শোভন ও স্বাভাবিক। মিথকল্পের সঙ্গে আধুনিক চৈতন্যের সংযোগ সাধিত হয়েছে 'মরচে-পড়া পেরেকের গান' কাব্যের নাম কবিতায়। এ কবিতার মূল প্রসঙ্গ হল প্রেম এবং এই প্রেমকে বিভিন্ন মাত্রায় কবি রূপে প্রকাশ করেছেন। বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, আধুনিক সভ্যতায় ব্যক্তির অবস্থান ও অবদান এ কবিতায় ঋষ্যশৃঙ্গের রূপকে প্রতিফলিত। বর্তমানে পেরেকে পরিণত ঋষ্যশৃঙ্গ আশ্বিনের সকালে পথে বেরুনো কবিকে শুনিয়েছে তার পুর্বজন্মের অবিস্মরণীয় প্রেমকাহিনী। যুগ যুগান্তরব্যাপী স্বর্গপ্রত্যাশী ঋষ্যশৃঙ্গ স্মরণ করছে তার অপাপবিদ্ধ নারীস্পর্শহীন জীবনে নারী এবং সুন্দরের আবির্ভাব:

বাহুতে হিল্লোল তুলে এগিয়ে এলো, জলের স্রোতে জ্যোৎস্নার মতো চঞ্চল,
পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে যেমন রৌদ্রকণা, তেমনি তার কঙ্কনের রশ্মি

শঙ্খের মতো গ্রীবা, দুটি কান যেন উজ্জ্বল কমণ্ডলু,
বুকের দুটি মাংসপিণ্ড নৈবেদ্যের মতো বিদগ্ধ ও বর্তুল,
শরতের বৃষ্টির মতো স্বচ্ছ ও আর্দ্র তার দৃষ্টি,
তার আননে চৈত্রপূর্ণিমার আকাশের আনন্দ,
মন্ত্রোচ্চারণের ছন্দ তার জানুতে ও জঙ্ঘায়
এমনি করে এগিয়ে এলো, তার নিঃশ্বাস স্পর্শ করলো আমাকে।[২৯]

[মরচে পড়া পেরেকে গান, *মরচে পড়া পেরেকে গান*]

বুদ্ধদেব বসুর কাব্য বাংলা সাহিত্যের অনিন্দ্য সংযোজন। তাঁর কাব্যস্পৃহা সাধারণ পাঠকের দ্বারা উদ্ধার করা সম্ভব নয়। তবে, আমার এ প্রচেষ্টা বুদ্ধদেব বসুকে আবিষ্কারের প্রাথমিক সোপান বলে মনে করি। নারীর প্রেম ও প্রকৃতি কবির কাছে যেমন ক্ষণকালের, তেমন শাশ্বত। এই নারীকে কবি তাঁর প্রেম সম্পদের জন্য কবিতায় অনুপম শব্দভাষ্যে রূপায়িত করেছেন। প্রেম ও প্রকৃতির মাঝে আন্তঃসম্পর্ক গভীর ও অবিচ্ছেদ্য। তাই বুদ্ধদেব বসু তাঁর কাব্যে এ দুটি প্রসঙ্গকে চমৎকার ভাষাবিন্যাসে বাণীমূর্তি দান করেছেন। এই শক্তিমান কবি বাংলা সাহিত্যে টিকে থাকবেন অনেক দিন পর্যন্ত।

তথ্যসূচি:

১. হুমায়ুন কবির, *বাঙলার কাব্য*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ৩৭
২. হুমায়ুন কবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
৩. বিশ্বজিৎ ঘোষ ও সিরাজ সালেকিন সম্পাদিত, *বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবার্ষিক স্মরণ*, আবু দায়েন, বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যতত্ত্ব, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০১১, বর্ণায়ন ৬৯ প্যারীদাস রোড, বাংলা বাজার ঢাকা-১১০০, পৃ.৬৫
৪. বিশ্বজিৎ ঘোষ ও সিরাজ সালেকীন সম্পাদিত, *বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবার্ষিক স্মরণ*, বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যতত্ত্ব (আবু দায়েন), বর্ণনায়ন, ৬৯ প্যারীদাস রোড, বাংলা বাজার-ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১, পৃ.৭৭
৫. বিশ্বজিৎ ঘোষ ও সিরাজ সালেকীন সম্পাদিত, *বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবার্ষিক স্মরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭
৬. ড. মাসুদুল হক, *বাংলাদেশের কবিতার নন্দনতত্ত্ব*, আবদুল মান্নান সৈয়দ, পরাবাস্তব কবিতা, চারিত্র কবিতা, ঢাকা, আগস্ট, ১৯৮২, পৃ. ৫৬
৭. মাহবুব সাদিক, *বুদ্ধদেব বসুর কবিতা: বিষয় ও প্রকরণ*, প্রথম প্রকাশ: চৈত্র ১৩৯৭/ মার্চ ১৯৯১, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৯৩
৮. বুদ্ধদেব বসু, *রচনাসংগ্রহ ৮*, কাল, কঙ্কাবতী, প্রথম প্রকাশ: ১৪ এপ্রিল ১৯৮১, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ৫
৯. জীবেন্দ্র সিংহরায়, *আধুনিক কবিতার মানচিত্র*, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৮৬, পৃ. ১৭১
১০. বুদ্ধদেব বসু, *রচনাসংগ্রহ ৯*, আটচল্লিশের শীতের জন্য: ২, যে আঁধার আলোর অধিক, প্রথম প্রকাশ: ২ ভাদ্র, ১৩৯১, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ১২২
১১. বুদ্ধদেব বসু, *রচনাসংগ্রহ ৯*, ঋতুর উত্তরে, যে আঁধার আলোর অধিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯
১২. মাহবুব সাদিক, *বুদ্ধদেব বসুর কবিতা: বিষয় ও প্রকরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
১৩. বুদ্ধদেব বসু, *রচনাসংগ্রহ ৮*, 'মধ্য-রাত্রে', কঙ্কাবতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
১৪. বুদ্ধদেব বসু, *রচনাসংগ্রহ ৯*, স্বাগতবিদায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

১৫. বুদ্ধদেব বসু, *রচনাসংগ্রহ ৯*, ঋতুর উত্তরে, যে আঁধার আলোর অধিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯
১৬. আজহার ইসলাম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, আধুনিক যুগ, অনন্যা, ৩৮/২ বাংলা বাজার ঢাকা। প্রথম প্রকাশ; অক্টোবর, ১৯৬৯, পৃ. ৭৬২
১৭. The Collected poems of D. H. Lawrence, Martine secker, London, Single Volume, Edition ১৯৩২, p. ৩৩৪.
১৮. অমলেন্দু বসু, *সাহিত্যচিন্তা*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৮৯
১৯. সাহিত্যচিন্তা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২
২০. নরেশ গুহ সম্পাদিত, *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা*, 'বন্দীর বন্দনা', 'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩
২১. মাহবুব সাদিক, *বুদ্ধদেব বসুর কবিতা: বিষয় ও প্রকরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
২২. বুদ্ধদেব বসু, *বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ ৮*, কঙ্কাবতী, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ১৯৮১, পৃ. ১৮
২৩. বুদ্ধদেব বসু, *রচনাসংগ্রহ ৮*, কাল, কঙ্কাবতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
২৪. বুদ্ধদেব বসু, *রচনাসংগ্রহ ৮*, কালো চুল, দ্রৌপদীর শাড়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬
২৫. মাহবুব সাদিক, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৩
২৬. বুদ্ধদেব বসু, *রচনাসংগ্রহ ৮*, 'প্রেমের কবিতা' দ্রৌপদীর শাড়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬
২৭. বুদ্ধদেব বসু, *রচনাসংগ্রহ ৮*, 'স্বয়ংবরা' দ্রৌপদীর শাড়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮
২৮. বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, *বুদ্ধদেব বসু, শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, আজকাল, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৫৭১
২৯. *রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা*, অনুবাদ, ভূমিকা, বুদ্ধদেব বসু